আদম আলির স্বাধীনতা

শাহেদ মোহাম্মদ

আদম আলির স্বাধীনতা
শাহেদ মোহাম্মদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৬০ টাকা

Adam Alir Sadheenata by Shahed Mohammad Published by Kobi Prokashani
85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka-1205
Second Edition: February 2021
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 160 Taka RS: 160 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-93397-6-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

সহধর্মিনী– জয়নাব খাতুন

লেখকের কথা

আমি লিখতে বসেছি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে সেই সংগ্রামে নিবেদিত অন্যতম এক যুবকের কর্ম– তার স্বাধীনতার পথচলার কথা। খুব স্বাভাবিকভাবে যে সমাজ ও দেশ প্রেক্ষাপটে যুবক তার মর্মগত আকাঙক্ষা চরিতার্থের নামে যে অবর্ণনীয় বিধ্বস্ত পরিণতিতে উপনীত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে সপরিবারে, তারই অতি সংক্ষিপ্ত মসিচিত্র এই 'আদম আলির স্বাধীনতা'। অবশ্য যুবকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে– (এক) জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, (দুই) মনের মানসিকেও পেয়েছে বটে; কিন্তু যে ভাবে যে পর্যায়ে তা কারো কাম্য নয়। ব্যক্তি হিসেবে একজন আদম আলি; কিন্তু প্রতীকী অর্থেও সে মানুষ– অসংখ্য সাধারণের এক জন। এমন কত যে বাঙালি জন সেই স্বাধীনতার যুদ্ধে পিষ্ট হয়েছে সে পরিসংখ্যান আমাদের কাছে কাগজে কলমে কতটা আছে? আর অল্প কাল মধ্যেই মুক্তি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ যোদ্ধা এবং সহযোদ্ধারাও বিদায়ের পথে। সেই প্রেক্ষাপটে– জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা আনতে গিয়ে আমাদের কতজন কত কি যে হারিয়েছে এবং স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর ভাষণের– এবারের সংগ্রাম ১. মুক্তির সংগাম, ২. এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এর দ্বিতীয়টি নয় মাসের যুদ্ধে অর্জিত হলেও প্রথমটির অর্জনে আমাদের সুদূর পরাহত ধৈর্য, অধ্যবসায়; প্রয়োজন যে সেই ৭১ এর মত সর্বাত্মক সংহতি। সেজন্য আমাদের আরও প্রস্তুতি, আরও ত্যাগ চাই সেই সেদিনের মতই। তাই আন্ত সাম্প্রদায়িক ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা বিগত স্বাধীনতার যুদ্ধ আর এই যুদ্ধোত্তর সমৃদ্ধ জীবন সংগ্রামে বিকল্প আমাদের নেই– সেই কথা এই আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রথম অধ্যায়

বিশ শতকের ষাটের দশকের কথা। আমরা পাঁচ সাত জন ছেলে মেয়ে দলবলে স্কুলে যাই। আমাদের স্কুল পড়ুয়া সে সময়টায় দেশের রাজনৈতিক হাওয়া, অর্থনৈতিক-টানা পড়েন যেমনই থাকুক তাতে এই ভবিষ্যৎগামী শিশু-কিশোরদের মনের খোরাকে যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পুষ্টি যুক্ত হয়েছে তা কোন যাদুঘরে রাখা গেলে সে হতো বিশ্বের সেরা আর্কাইব। কেননা ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হতে এ দেশে বাঙালির সমাজ জীবনে ১৯৫২ এর ভাষা ভিত্তিক উত্তেজনা– আত্ম উপলব্ধির চেতনা থেকে শুরু করে ১৯৭১এর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিজয় দিবস পর্যন্ত বাংলাদেশের অতীত বর্তমানের সব চেয়ে তরল-উচ্ছল-আত্ম-উর্বর সময় কাল। এতো মিছিল-সংগ্রাম এবং এতো সংহত-ঐকবদ্ধ অবস্থানে এ দেশের মানুষকে পূর্বে আর দেখা যে যায়নি তা জীবনের এতোগুলো বছর পেছনে ফেলে এসে তর্কাতিতভাবে আমি বলতে পারি– এই দেশের পূর্বাপর ইতিহাস-সমাজ জীবন পর্যালোচনা করে।

আমরা সবে মাত্র প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র। কিন্তু চোখে-কানে– দেহের সবগুলো ইন্দ্রীয় দিয়ে এমন সব দৃশ্য-শব্দ– অনুভূতির আমদানি সে সময় হতে থাকে যে, দেশটা ক্রমান্বয়ে গরম হতে হতে একেবারে তেতে যেয়ে এক সময় আগুন ধরে জ্বলে পুড়ে ছারখার হতে শুরু করল, আমাদেরই চোখের সামনে। আমাদের সময় কালের যে দেশ-কাল সেই তথা কথিত কৃত্রিম নাম পূর্বপাকিস্তানে পরিবর্তনের যে হাওয়া বইছিল তা যাদের মনে মগজে ধরা পড়ে তেমন ব্যক্তিদের অন্যতম একজন ছিলেন আমাদের এক শিক্ষাগুরু– বাবু ভূবণমোহন চক্রবর্তী। সাধারণের কাছে তিনি ছিলেন কর্তা মশাই, আর আমরা তাঁকে ডাকতাম ঠাকুর দা বলে। সেই ষাটের দশকেও ঠাকুর দা নিয়মিত ডাকে আসা পত্রিকা পড়তেন যোগাযোগহীন অখ্যাত সীমান্তবর্তী পাড়া গাঁয়ে বসে, রেডিও শুনতেন– বিবিসি, ভয়েস অব এ্যামেরিকা। আমাদের শ্রেণি কক্ষের পাঠদানের সময় প্রসঙ্গ পেলেই জগৎ জীবনের নানা বিষয়– রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ- দেশের নানান খবর ঃ কাঁচা মরিচ, হলুদ, আদার বাজার দর, গ্রামের সমাজ পতিদের চাল চরিত্র নিয়েও কথা বলতেন।একদিনের কথা মনে পড়ে। ইতিহাসের পাতা থেকে চোখ তুলে বলেছিলেন ঠাকুর দা– এই দেশটা চির কালের বাংলাদেশ। এ দেশের নাম আজ পূর্ব পাকিস্তান হলেও এক সময় ছিল বাংলাদেশ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এ দেশের আদি ও আসল নাম এটি, আরও আগে– (প্রাচীন কালে) ছিল 'বঙ্গ' নামে। বৃহত্তর অর্থে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত একেবারে অজয় নদীর দুইধার সহ সেখান

আর সে কোন্ কারণে রোজই বড়দের আমরা দেখতে পাচ্ছি না সন্ধ্যা রাতে। তারা আসে হয়তো আমরা ঘুমিয়ে পড়লে। আমাদের ছোটদের পৃথিবীতে নিরবতা। কিন্তু বড়দের দেশ জোড়া একটা কি সমস্যার উথাল পাথাল ভাব ক্রমে আমাদেরও মনের দিগন্তেও একদিন ইশান কোণে কাল বৈশাখির ঝঞ্জার আভাষের মত স্পষ্ট হচ্ছে– লক্ষ করলাম। সেই ঘোর একদিন স্পষ্ট হোল আমাদেরই স্যার ঠাকুরদার আর একদিনের কথায়। উনি বরাবরের মতই পড়াতে এসে বললেন, "দেশটাতে না জানি কী হয়রে!" আবার হয়তো একেবারে আতঙ্কিত হয়ে হাতের বই খানি উল্টে রেখে ক্ষণেক নিরব হয়ে বসে রইলেন।

তখন দেশে এত কলেজ ছিল না। প্রায়ই হাট বাজারে গিয়ে দেখি বিশেষত আমাদের এলাকায় হাই স্কুলের ছাত্ররা হরতাল দিয়ে জন মানুষদের নিয়ে সভা করছে। বাজারে কেনা বেচা শুরু। হঠাৎ বারটা বা সাড়ে বারটার সময় যেন বিদ্যুৎ বেগে এসে সভ্যতার কোন নতুন জগতের চমক-তথ্য দিতে এক পাল ছাত্র মিছিল করে এসে বলে গেল– জয় বাংলা, জয় বাংলা– 'জাগো, জাগো, বাংগালী জাগো।' 'একটা হতে দুইটা পর্যন্ত হরতাল হরতাল।' 'পদ্মা-মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা।' স্কুল ফেলে আমাদের এলাকার থানা ও বিদ্যাকেন্দ্র-প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র কলমাকান্দায় খুব বেশি যাওয়া হয় না। তবু যে দিনই যাই,সেই দিনই এমন দৃশ্য-এমনই উত্তেজনা-উৎকণ্ঠার নমুনা পাই কান ভরে দুচোখ জুড়ে–। গ্রাম থেকে প্রধান সড়ক, বড় বড় স্থান গুলো কেমন উত্তেজনায় উত্তাল হয়ে হয়ে হচ্ছে উন্মাতাল। কী যে বিপ্লব বিপ্লব ভাবের জোয়ারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে সারা পূর্ববাংলা (পূর্ব পাকিস্তান তা যেন আজ আমি কেবল ভাষার আখরে তুলে ধরতে দুর্বল হাত থেকে যেন কোন বস্তু বার বার পড়ে যায় আমার তেমনই মনে হচ্ছে। ঐ যে আমার স্যার ঠাকুর কর্তা মহাশয় বলেছেন, শেখ মুজিব আবারও সেই (আদি) বাংলা নাম ফিরিয়ে আনতে চান, সেই বাক্যটা মনে আসে। এখানে উল্লেখ্য–

আমি সেই সময়ের কথা বলছি– তখন শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে আগর তলার মামলা চলছে। তিনি তখনও 'বঙ্গবন্ধু' উপাধী লাভ করেন নি। আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণির ছাত্র। শেখ সাহেবকে আগর তলা মামলা থেকে মুক্ত করতে পুরো ছাত্র সমাজ লড়ছে– বুদ্ধিজীবীদের মাথায় অনেক অনেক তত্ত্ব ও তথ্য এসে ঘুর পাক খাচ্ছে।

আরও দু বছর পরের কথা। স্কুলের টিফিন চলছে। পেছনে পাহাড়ি ঝর্ণাটির বুক জুড়ে ভোর রাতের পাহাড়ি বৃষ্টির জলের ঢল এসে ভরিয়েছে উপচে পড়ে। নতুন করে আর বৃষ্টি না থাকায় ক্রমে ক্রমে শুকাতে শুরু করেছে জল। ঝর্ণা সদৃশ পাহাড়ি ছড়াটার দুকুল সমান বালু ভরা। এক কালে এরও নদীর মত দুধারে পাড়ের চিহ্ন ছিল; কিন্তু এখন এ এক ছড়া। তীর নেই, আছে বালুকাময় যে কিনারা তা-ও প্রায় দুপাশের মাঠের সম তলে প্রায়। মনে আছে– আদমকে সুন্দরী ডাকছে হাতের ইশারায়; যেন নাক চুলকোচ্ছে। আদম সুন্দরীর সতীর্থ– এক শ্রেণির পড়ুয়া। সারা স্কুলে আদমের মত বলীষ্ঠ দেহী, বয়সে বড় চালাক চতুর ছাত্র আর বেশি নেই। দুটিতে বেশ খাতির। তবে তা সবার চোখে ধরা পড়ে না।

সুযোগ পেলেই একজন আর জনের পাশে এসে যেন শূন্য স্থানে পরস্পর মিলিত হয় আকাশের দুই তারা।

–ওই তাল গাছ তুই পাশে এলে আমার ভাল লাগে কেনেরে!– দৃপ্ত চাহনিতে বাক্যটা উচ্চারণ করেই ঘার কাত করে দুচোখ মেলে রাখে সুন্দরী।

আদম এমন একটা বাক্য কেবলই যেন গিলে। কোন সংবেদনা– না কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে দূরের কী এক ভাবনা থেকে মনটা টেনে এনে সহজ করে উত্তর যোগায়–

আমি আদম, তই হাওয়া, বিবি হাওয়া যে!– এবার সুন্দরী কেন যেন শরম বোধ করে। ঘার কাত করে এক দৌড়ে চলে যায়।

সবে বৃষ্টি ধরা আকাশ। এক ঝাঁক সোনালি রোদ সুন্দরীর মুখ মন্ডলে পড়ে ওর দুধে আলতা গায়ের রং দিয়েছে আরো বাড়িয়ে। ঢলের জল ছড়ার বুকে সুতা নলি সাপ ভাসিয়ে এনে ফেলেছে। সবাই যখন সুতার মত লম্বা লম্বা সাপগুলো কাঠিতে পেঁচিয়ে খেলায় রত সেই কোলাহলে আদম-হাওয়া দুটিতে আবিষ্ট মনযুগলে। স্বর্গের কথা জানি না, পৃথিবীতে নর-নারী কিশোর কিশোরীরা এভাবেই মন নিয়ে খেলে। তবে সে খেলা যে কেবল সুতানলি নয়, প্রকৃতই সাপনিয়ে খেলা, সমাজ দেশের অনেক ক্ষেত্রের তেমন ঘটনার কথা পাঠকের অজানা নয়।

আবার সেই শ্লোগান' জয়বাংলা জয় বাংলা, 'তোমার আমার ঠিকানা– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।' 'জাগো, জাগো বাঙ্গালী জাগো।'– শ্লোগানে শ্লোগানে ইতোমধ্যে সে পূর্বপাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা উচ্চকিত। আর সব চেয়ে যারা এ শ্লোগান আর এই বাঙালি সংস্কৃতির আড়মোড়া ভাঙায়– জেগে উঠায় প্রমাদ গনে দুর্ভাবনায় পড়ে, তারা পাস্তিানের শাসক ও তাদের সঙ্গে সুবিধাভোগী এ দেশীয় দোসর। তাই বাঙালিদের নিবৃত করতে বাংলা ভাষা, বাংলা গান বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাংলাদেশের মেলা– গণমুখি কর্ম-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের উপর এমন কি ধর্মের নামে ফতোয়া জারি করে বিধি নিষেধ আরোপ করতে থাকে।

বাংলার, মাটি-জল, আলো-হাওয়া, এই সমতলের ভাষা– সংস্কৃতি কেবলি সংদেনশীল নয় কেবল, বলা যায় সংক্রামক। এখানে যে কোন কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়া হয় অতিদ্রুত। তাছাড়া এই দেশে নদ নদীগুলো যেমন উর্বর পলি দ্বারা কেবল সভ্যতার ভিত্তি রচনা করেনি, যে কোন কিছুকে একেবারে কীর্তীনাসা নীতিতে নির্মূল করে খাড়ার উপর– তা পাকিস্তানীরা বুঝতে পারেনি, কিংবা সামান্য বুঝতে পারলেও চরম পরীক্ষার জের অনুমান করতে পারেনি তখনও।

তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, তুমি কে আমি কে বাংগালী বাংগালী, জাগো জাগো বাংগালী জাগো।– ইতোমধ্যে বাংগালী জেগেছে। সে পরিচয় বাংগালী দেখিয়েছে ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ তে, ৫৪এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে। আগর তলা মামলায় শেখ মুজিব পাকিস্তান সরকারের জেলখানায় থাকা অবস্থায় 'জেলের তালা ভাংবো শেখমুজিকে আনবো'– এ শ্লোগানের প্রত্যক্ষ ফলও তারা দেখিয়েছে তাঁকে মুক্ত করে। তুমি কে? আমি কে? বাংগালী বাংগালী।' 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'ঢাকা না পিন্ডি (রাওয়াল পিন্ডি)?

ঢাকা, ঢাকা।' পূর্ববাংলার জনগনও শেখ মুজিবের ধরিয়ে দেয়া এসব শ্লোগানের মর্মার্থ বুঝেছে। আর সেই কারণেই তাদের নেতা হিসেবে তাঁকে কৃতজ্ঞা পাশে বেঁধে নিয়ে ১৯৬৯ এ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধী প্রদান করে। বাঙালির নেতা ও জনতার উপলব্ধি যে এক তা দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন। তবে পাকিস্তান সরকার অবশ্য এতোটা বুঝতে পারেনি যে বাঙালিরা এতো ঐক্যবদ্ধ হবে; যদিও ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি ৫২র ফেব্রুয়ারিতে সংহতি আর সাহসের পরিচয় দেখিয়েছে–। তাই তথাকথিত পূর্ব পাকিমস্তানে স্বায়ত্ব শাসনের দাবীর আন্দোলন চলছেই। পাকিস্তান সরকার বাঙালির সে স্বায়ত্ব শাসন– আত্ম নিয়ন্ত্রনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমন পীড়ন চালাতে থাকে। এ খানে সবচেয়ে যে বিষয়টি উল্লখ্যে তা হলো, এরই মধ্যে স্বদেশের শতকরা ৯৯ জন মানুষের মনে শেখ সাহেব নিজের ঠাঁই করে নিয়েছেন শ্লোগানে শ্লোগানে– 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা,' 'জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো'– এই স্বাদেশিক বার্তায়-মননবোধের ঐকসূত্রে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৈত্রের দাপ দাহে জ্বলছে দেশ। সেই আশ্বিনের পর আর বৃষ্টি নেই। খররোদে পুড়ছে মাটি। দুপুরে দুটো পাট সোলা বা কাঠিতে ঘষা লাগলে আগুন ধরে যায় এমন গরম– উত্তপ্ত প্রকৃতির সব কিছু শীতের পর, বসন্ত ঋতুর শুরুতে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন সে দিনের পূর্বপাকিস্তানে ছাত্র-জনতা– সব মানুষের মনে জ্বলছে উত্তেজনা-আত্মচেতনার আগুন; যে আগুন বায়ান্নে মাতৃভাষাকে রক্ষার স্বার্থে জ্বলেছিল বাঙালি মুল্লুকে দাবানলের মত, বাংলা মায়ের সন্তানদের অন্তরে আজ যেন আবার সেই উত্তেজনার আঁচ লেগেছে। না, কেবল শেখ সাহেবকে ছেড়ে দিলেই চলবে না, পদ ত্যাগ করে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে চলে যেতে হবে, ইলেকশন দিতে হবে এক ব্যক্তি এক ভোট ভিত্তিতে– এমন দাবী সেদিনের সারা পূর্বপাকিস্তানে।

যদি এমন হয় যে, শেখ সাহেবকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, তবুও কি বাঙালির মনের আগুন ধপ করে নিভে যাবে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে? কিন্তু তবুও বোধ করি সহসা সান্ত হচ্ছে না পূর্ব পাকিস্তান। মিটিং-মিছিল চলছেই; নিত্য দিনের চিত্রই ঐ– সুবিধাবাদী মৌলিক গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে বিদায় করতে শহরে-গঞ্জে এমনকি গ্রামের অতি ছোট হাট বাজার গুলোতেও মিছিল মিটিং– যথাতথা জটলা-সর্বত্র আলোচনা, চায়ের কাপে ঝড়। এই বাংলার এমন কোন জনপদ নেই যেখানে বাংলার মানুষ আলোচনা না করছে শেখ মুজিবকে নিয়ে। এ দেশে শিক্ষার হার মাত্র ২৪ থেকে ২৬ শতাংশ। অশিক্ষিত– প্রায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠিতে গণতন্ত্র, স্বায়ত্ব শাসন এবং মাত্র দুবছর আগে ১৯৬৫র ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের লাহোর সেক্টরে পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে কাশ্মির নিয়ে যে যুদ্ধ হয়েছিল সে যুদ্ধে বাঙালি সৈনিকের বীরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে।

শেখ সাহেব তার মিটিং-মিছিল বিশেষত ছাত্র লীগ-ছাত্র ইউনিয়নের সভা সমাবেশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তথা বাঙালিকে অবগত করতে এতোটাই সক্ষম হয়েছিলেন যে, এক নামে বাঙালির নেতা আর তার বিপরীতে স্বৈর শাসনে সিংহের মত শক্তিশালী অথচ বাঙালির স্বার্থ বিরোধী হবার কারণে আয়ুব খান ঘৃণায় পঁচে গিয়েছিলেন। শহরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিদিন সংগামী– রণাঙ্গন রাজ পথ জনপদে মিছিল করে চলেছে– ঝাঁঝালো শ্লোগানে : 'আয়ুব শাহীর গদিতে আগুন জ্বালো এক সাথে, আয়ুব যদি বাঁচতে চাও বাংলা ছেড়ে পিন্ডি যাও। একই সঙ্গে চলছে ব্যঙ্গ-প্যারোডি। সেদিন বাংলার তারুণ্য যে ভাবে জেগে উঠেছিল তার উদাহরণ ঘৃণা ও দোহের, সব টুকু যেন ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়।

আদম শহরে দেখে এসেছে– একটি লগির মত লম্বা মুলি বাঁশে কপিকলের সঙ্গে কোথা থেকে ধারী ইঁদুর একটা ধরে এনে দড়ি দিয়ে বেঁধে শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে নামানো উঠানো হচ্ছে– 'আয়ুব তোমায় নামতে হবে, নামতে হবে, নাম্।' ঘৃণা প্রকাশের তারুণ্যের এই অভিনবত্ব বাঙালির ঘৃণার অগ্নিতে রোষের ঘৃত যুক্ত করেছিল। আদম সে দৃশ্য অনুসরণ করে নিজের এলাকায়ও তা প্রদর্শন করে। কলেজ থেকে মিছিলের পুরোভাগে ওটিকে ধরে এগিয়ে যায়।

পরদিন সুন্দরী ছুটে যায়–

আদম ভাই, তোমার ইঁদুরটা কোথায়?

ঃ কেনরে!

ঃ ওর দফা যে কী! একবার দেখতে ইচ্ছে করেনা!– কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে সুন্দরী বলে।

খুব স্বাভাবিক মেজাজে আদম বলে, ওটা তো পঁচে গেছেরে!

ঃ ওটা বুঝি আয়ুব খাঁ?–বিদ্রুপ ও বিজয়ের হাসি ওর মুখে।

ঃ হ্যা, ওর অবস্থা আয়ুব শাহী। গত রাতে ও পদ ত্যাগ করেছে, জানিসনে। ওকে ভাগারে ফেলে দিয়েছি। ওতে আর আমাদের কাজ নেই।

"আদম ভাই, আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি একবার এসো, মা তোমায় দেখতে চেয়েছে" কি এক অভাবিত, অপরিমিত মায়া, ধ্রুব তারার ঔজ্জ্বল্যযুক্ত দুটি চোখে সে তাকিয়ে! সম্মোহনের কী সুধা যে জড়ানো সে মুখমন্ডলে! অনুরোধ ফুটে উঠে সুন্দরীর মাধুরি কণ্ঠে।

মাঝে মাঝেই সুন্দরীর মা আদমকে ডেকে পাঠায় ওবাড়ি। ওদের বড় গোষ্ঠীর ছয় কাকা জেঠার মধ্যে সুন্দরীর বাবা পঞ্চম। তিনি গত হয়েছেন। বিশাল একটা পুকুর, সাত আট বিঘা ব্যাপী আম কাঁঠাল-সুপারী নারিকেলের বাগান আর মাঠ জুড়ে দোফসলা জমি। খাই খরচার অভাব নিয়ে ওদের ভাবতে হয় না। লোকটা বেঁচে থাকতে বাড়িটাতে সব সময় লোকের যেন হাট লেগে থাকতো। এখন সে বাড়ি মুখো কেউ হয় না।

পাড়া গাঁয়ে মেয়েদের পড়া লেখার কথা কে ভাবে। তবে সুন্দরীর বাপ ভাবতো। আর আদম? কেবল ভাই পো বলেই নয়, ভাল ছাত্র আর দুরন্ত সাহসী

ছেলে হবার কারণে আদমকে কাকা হামিদুদ্দিন– সুন্দরীর বাবা আর আর ভাতিজাদের চেয়ে একটু বেশি ভালবাসতেন, কাছে কাছে রাখতে চাইতেন। সুন্দরীর মা সে ধারাটা ধরে রাখতে চান। ছেলেটা এখন শহরের কলেজে পড়ে। আগের মত ওকে পাবার সুযোগ নেই। এ ছাড়া দেশের রাজনৈতিক গন্ধ যেন ওকে সুঁকে সুঁকে বেড়ায় নাকি ও-ই রাজনীতির পোকা, তা সুন্দরীর মা আলেয়া বেগমের মাথায় কেমন ঘুর পাক খায়, বুঝতে পারে না।

সেদিনের কথা। আদম এসে বসেছে সুন্দরীদের ঘরে। ফাল্গুনের শেষাশেষি সময়– পরন্ত বিকেল। গরম পড়েনি। বাতাস কম থাকার কারণ আর বদ্ধ ঘরের মাঝে দুই তরুণ তরুণী পাশাপাশি বসার কারণেই হয়তো ওদের চার পাশের বাতাস একটু ঘন হয়ে গুমোট ভাবাবেশে ঘিরে ধরেছে মনে হলো। সুন্দরী ফুল তোলা হাত পাখাটা নিয়ে বসে আদমকে হাওয়া করছে। কাকিও এসেছে একটা পাকা পেঁপে হাতে। সদ্য ধোয়া হাতের দা বেয়ে বেয়ে পানি পড়ছে। সুন্দরী সেই যে ঘরে ঢোকা মাত্র আদমের মুখের পানে তাকিয়ে আছে তার সে দৃষ্টিতে আর পলক পড়ছে না। আদমের শরম করে না বুঝি। এক সঙ্গে বেড়ে উঠা ছেলে মেয়ে ওরা, তাও আবার একই বংশের, তবুও।

বাবা আদমরে, আমি তোর কথা ভুলতে পারি না। তুই তো বাপ আমাদের ভুইলা যাইতাছোস্। আমি বড় বুঝিরে (আদমের মাকে) দেখা হইলেই বলি আদম কবে আসবে। কত তাকিয়ে থাকি তোর পথ চেয়ে।

আদমের এই কাকার ঘরে কোন ছেলে সন্তান নেই। মাত্র দুটো মেয়ে। বড় মেয়েটার বিয়ে হয়েছে পাশের গাঁয়।

বা হাতে পেঁপের থালাটা আর ডান হতে এক গ্লাস পানি ধরে আদমের মুখ পানে চেয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করে আলেয়া বেগম।

ঃ খালি খালি কলেজের পড়া শোনা না, রাজ নৈতিক কাজের চাপে কাকি আমার বাড়ি আসতে সময় হয় না। বিশ্বাস করেন, আমি আপনে গো ভুলি নাই।– একটু করুণ শোনাল আদমের বাক্যটার শেষ অংশ।

কাকি বুঝলো না, ছেলে মানুষের আবার রাজনৈতিক চাপ কী। আসলে বাংলা দেশের ঐ সময় কালটাতে এ দেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কী ভূমিকাটি যে পালন করেছে সেই সময়ের রাজনীতি-সমাজ সচেতন মানুষ মাত্রেই অবগত। এখন বা অন্য কোন সময় কালের বা অন্য স্থান কালের মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারবে না।

তোমার কাকা যে তোমারে কত ভালবাসতো তা তুমি জানো, মনে আছেরে বেটা?– ছোলানো পাকা পেঁপেটা তখন দায়ের উপর দোফালি হয়ে আলেয়া বেগমের দুহাতে বটি চাপা অবস্থায়। ঐ অবস্থায়ই কথা বলতে বলতে আলেয়া বেগম আদমের মুখের একটা বাক্য প্রত্যাশায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঃ আমি তা জানি কাকি, আমার মনে আছে। কিন্তু দেশের অবস্থাটা কি! এই গভীর গ্রামে থেকে তা বুঝতে পারছেন না।– একটু ধীরে, বয়স্ক মানুষের মত উচ্চারণ করে আদম! মিটিং মিছিল– কত কাজ কাকি!

৩য় অধ্যায়

মিছিল থেকে ফিরেছে আদম গভীর রাতের নিরব প্রহরে। কেউ জেগে থাকার কথা নয় এতো রাতে। ভেজানো দরোজায় চাপ দিতেই খুলে গেল দরোজা। ঘরে প্রবেশ মাত্র অস্ফুট চাপা স্বরে বাজে মায়ের কণ্ঠ কথা,

বাবা, হাত মুখ ধুয়ে আয় জলদি।

বেড়ালের থাবা যেমন মাটিতে পড়ে আদম তেমনি বাবার ভয়ে ধারি পা দুখানির নরম মাংশল পাতা আলগোছে মাটিতে ফেলে ফেলে পা টিপে টিপে পশ্চিমের রান্না ঘরের সামনে যায়। বিড়াট মেটে জালাটা থেকে হাতেই পানি তুলে মুখ ধুয়ে কুলিটা ফেলে হালকা ফ্যাস করে– যেন শব্দটা কম হয়। বাবা এ গভীর রাতে জেগে উঠলে খবর আছে। ভয় আর হালকা শীত এক হয়ে জানান দিচ্ছে– শীত এখনো কম নয়, যে শীতে বামুন গরু বেচেঁ কাঁথা কিনে। রান্না ঘরটার ওধারে পশ্চিম দিকে পুকুরের গা ঘেসে মাত্র এক চিলতে জমি। সেটার ওদিকে সবজি ক্ষতের ওদিকে, বিশাল দীঘির পাড়ে জোনাকির আলোর ভিরে চোখ যেতেই একটু দাড়ায় আদম। ও যে আলোর যাদুর কী এক স্বপ্নপুরী যেন! উত্তর দিকের দশ বিঘা জমির ফল বাগানের গাঢ় কালো জমাট অন্ধকারের বুকেও ফাল্গুনের কৃষ্ণ পক্ষের আধার-কালোতে জোনাকিদের কী অপরূপ উৎসব! উঠানের উত্তর কোনায় দাড়িয়ে মুহূর্ত মাত্র ওদিকে দৃক পাত করে। পর ক্ষণেই দৌড়ে ঠান্ডা বাতাসকে এক লম্ফে ডিঙ্গিয়ে ঘরের মেটে পৈঠার উপর বাম পায়ের আঙগুল কটায় ভর করে ঘরে ঢোকে আদম আলি। দেখে মা দাড়িয়ে গরম ভাতের থালার উপর থেকে ঢাকনা সরাচ্ছেন। বাটি ভর্তি মুরগির মাংশ পাতের উপর ঢেলে দিয়ে কেমন অপরিচিতের মত নিঃশব্দে চলে গেলেন। তরকারির গন্ধ নাকের ভেতর দিয়ে চেতনায় প্রবেশ করে ওর ক্ষুধার উত্তেজনাকে এক্ষণে একেবারে মাতাল করে দিচ্ছে। খেতে বসে গোগ্রাসে গিলতে গিয়ে কেবল মনে পড়ে এতো রাতেও জেগে মা! সাথে গরম ভাত, মুরগির মাংশ!

আদম খাচ্ছে আর ওর মনের কানে বেজে চলেছে– গানের সেই কলিটা ঃ

'মায়ের মত আপন কেহ নাইরে–
মা জননী নাইরে যাহার ত্রিভূবণে তাহার কেহ নাইরে।'

বাইরে কুয়াশা ঘন হতে হতে যেমন বন বাদার-লোকালয় ঘিরে ফেলেছে, তেমনি আদম আলির দুচোখে ঘুম অন্তরের কোন্ অজানা প্রদেশ থেকে উঠে এসে তার চেতনাকে ক্রমেই বিলুপ্ত করে দিতে ব্যস্ত। থালার শেষ দুমুঠো ভাত অতি কষ্টে অর্ধ চৈতন্যে কোন রকমে গিলে ফেলেই আদম এঁটো হাতখানা ধোয়ার ছলে গ্লাসটা উঁবু করে শুধু ভিজিয়েই লুঙ্গিতে মুছে বিছানায় এলিয়ে দেয় দেহখানা। কাঁথা উঁচু করে ধরে মনে হয় যেন মাতালের কানে প্রবেশ করছে নিকটের কোন স্থানের একপাল শেয়ালের হাক, আর সে ঢুকছে শেয়ালের গর্তে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে– ঘণ্টা, মিনিট অনুমান নেই। মোয়াজ্জিনের আযান– "আস্সালামু খাইরুম্ মিনান্নাওম" আযান বোধ করি শেষ হয়নি। ওদিকে বাবা লোকটার হাকডাক শুরু।